শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : সৈয়দ ওয়ালীউল্লা

বর্ণালী ঘোষদস্তিদার
বাংলা বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

মনস্বী শিবনারায়ণ রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন 'প্রথম যুগের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর যিনি বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক' তিনি হলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লা (১৯২২--১৯৭১)। এ মন্তব্য হয়তো কারুর পক্ষে বিনা তর্কে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বাংলা ভাষার বিশশতকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যে তিনি পুনরাবৃত্তির দোষমুক্ত অভ্যাসের পরম্পরার বাইরে এবং স্বকীয়তা ও নিজস্বতাচিহ্নিত তা অনেক সার্থক ও খ্যাতনামা কথাশিল্পীই স্বীকার করবেন।

মাত্র তিনটিই উপন্যাস লিখেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লা। লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) এবং কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)। এছাড়াও তাঁর গল্পগ্রন্থ নয়নচারা (১৯৪৫) বহিপীর (১৯৬০) দুইতীর (১৯৬৫) তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪) প্রতিটিতেই যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। উন্মোচিত হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিতেই কথাশিল্পের ভুবনে তিনি নতুন এবং ব্যতিক্রমী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

'লালসালু' প্রথম আত্মপ্রকাশের পর পাঠক বা সমালোচক কারুর ই তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে নিজের গ্রন্থের মনের মতো সমালোচনা করিয়ে নেওয়াটা লেখক ওয়ালীউল্লার খুবই অপছন্দ ছিল। ফলে প্রথমে বহু বিদ্বজ্জনেরই দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায় 'লালসালু' উপন্যাসটি। পরে অনেকেই উপলব্ধি করেন যে বাংলাদেশের চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে লেখা এই উপন্যাসের ক্যানভাস যেমন বিশাল তেমনিই রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম বহুধাবিস্তৃত ধারায় বাহিত হয়েছে এর মহাআখ্যান (Narrative) যার বিচিত্র বর্ণ বিচিত্র শব্দ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এর বিষয়বস্তু শুধু বড়োই নয় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশাল তাৎপর্যমন্ডিত এবং দুঃসাহসিক। অথচ এর ফর্ম অনেকটাই সাদামাটা এবং নাটকীয়তা বর্জিত।

'লালসালু'কে বিচার করতে গেলে এর রচনাকালের রাজনৈতিক-সামাজিক আবহাওয়া একটু ফিরে দেখা দরকার। ১৯৪০ এ রাজনীতি ও ধর্ম কেমন অবলীলায় একাকার হয়ে যায়। এর সবচেয়ে বিপজ্জনক সমীকরণটি ঘটে তৎকালীন পূর্ববাংলায়। এই ব্যাপারটিই চিন্তাশীল ও অসাম্প্রদায়িক আধুনিক কথাশিল্পী ওয়ালীউল্লাকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। একজন ভন্ড ধর্মব্যবসায়ীর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রক্রিয়ার চিত্রায়ন এই উপন্যাসের বিষয়।

এক শস্যবিরল অঞ্চলের মাঝবয়সী দরিদ্র কাঠমোল্লা মজিদ খিদের জ্বালায় ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে দূরবর্তী গ্রাম মহব্বতনগরে এসে হাজির হয়। সেখানেই সে আবিষ্কার করে একটি টাল খাওয়া ভাঙা প্রাচীন কবর। সেটিকেই মোচ্ছাদের পীরের মাজার বলে ঘোষণা করে দেয়। এবার ওই মাজারকে কেন্দ্র করেই সে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে চায়। চাতুরী দিয়ে সে এলাকার সরল অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের সে বোকা বানাতে থাকে। নিরীহ ও ধর্মভীরু মানুষ গুলোর অন্ধবিশ্বাস ও দুর্বলতাক কাজে লাগিয়ে

দিব্যি ধনী হয়ে ওঠে। বিয়েশাদীও করে। অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ায় খবরদারি করার অধিকারও অর্জন করে। তার স্বৈরাচারী মানসিকতা স্পষ্ট হয় তখন যখন সে গ্রামের যুবক আক্কাসের স্কুলপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সরাসরি বিরোধিতা করে। পরিষ্কার বোঝা যায় তার প্রগতিবিরোধী মানসিকতা। সংকীর্ণ ধর্মের জিগির তুলে মজিদ যা-ই করতে যায় মসৃণ ভাবে বিনা প্রতিরোধেই করতে পারে কিন্তু আক্কাস বা প্রগতিশীল কারুর সমাজোন্নয়নমূলক কাজকে সে ধারাবাহিকতার সঙ্গে বাধা দিয়ে যায় সম্পূর্ণ আত্মস্বার্থে। তবে মজিদের এই আপাত বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে একসময় নিয়তির হাত ধরেই তার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে ঘনিয়ে আসে গভীর সংকট। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জমিলার সঙ্গে তার সম্পর্কে দেখা দেয় জটিলতা ফলে প্রবল যন্ত্রণাদায়ক অন্তর্দন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। মজিদ জানায় 'দুবেলা খেয়েপরে বাঁচার জন্য' সে এই লোকঠকানো কাজ করেছে। যদিও তা ইসলামে গুনাহ সে বলে, 'খোদার বান্দা' সে। নির্বোধ। জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি খোদা মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার সীমাহীন। ' নির্জন মুহূর্তে মজিদ ভাবে 'কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির যশ-মান ও আর্থিক স্বচ্ছলতার মূল কারণ এই কবর। যদিও সে জানে না কে চিরঘুমে শায়িত এর তলে। ' মাঝে মাঝে এই কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের উল্টোনো নগ্ন অংশই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মৃত লোকটিকে সে চেনে না। আর সেইজন্যই আজ সে অসহ্য ভৌতিক নিঃসঙ্গতা বোধ করে। এ নিঃসঙ্গতা কালের মতোই আদিঅন্তহীন। '

এ উপন্যাসের পটভূমি মুসলিম লীগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান যখন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হলো, যখন সংকীর্ণ ধর্মমতকে পুঁজি করে কপট রাজনৈতিক নেতারা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করলো। মজিদ ভুয়ো ধর্মগুরু সেজে গ্রামের মানুষের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারলেও হলেও সে বিলক্ষণ জানে যে তার পক্ষে কোনো অলৌকিক জাদুর ফুসমন্তরে ঝড়-শিলাবৃষ্টি,ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কিছুই আটকানো সম্ভব নয়। তবু অন্ধবিশ্বাস তার গভীরে। 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ'।

ধর্মীয় কুসংস্কারকে ও ধর্মব্যবসাকে কটাক্ষ করে বাংলা সাহিত্যে বহু উপন্যাসই রচিত হয়েছে। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা'। পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' তো হাস্যরসের মোড়কে সর্বকালের সেরা ধর্মব্যবসা ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ। 'লালসালু' সমাজবাস্তবতায় খানিক এগিয়ে। মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমা নিরীহ হলেও দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা যথেষ্ট প্রতিবাদী। জমিলা শেষ অবধি ঘেন্নায় থুথু ছিটিয়ে দেয় মজিদের মুখে। কবরেও পা পড়ে যায় তার অসাবধানতায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লার উপন্যাসের শিকড় পৌঁছে গেছে মুসলমান প্রধান বাংলাদেশের মাটির গভীরে। সেই শিকড়েই মাটির রস উঠে এসেছে ওপরে। জমিলা নিঃশব্দে সমাজের অন্ধবিশ্বাসের মূলে ও চেতনার মূলে যে আঘাত করেছে তা নিঃসন্দেহে সমকালীন মুসলমান সমাজে ধ্বনিত এক বিরল প্রতিবাদ। আর একজন নারীকে

দিয়ে দীর্ঘচারী কপটতা আর ভন্ডামির মুখোশ খোলার মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেছেন বলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাও মহৎ শিল্পী।

মাত্র ১৮০ পৃষ্ঠার উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' কাহিনীবৃত্তটিও খুবই সংক্ষিপ্ত। এক বাঁশঝাড়ের মধ্যে হঠাৎই একদিন এক উলঙ্গ যুবতীর মৃতদেহ আবিষ্কার করে বসে যুবক শিক্ষক আরেফ। তারপর থেকেই সে সত্যানুসন্ধানে লিপ্ত হয়। ক্রমশ সে জানতে পারে নিহত যুবতী হলো এক মাঝির বউ। আর ঘাতক হলো কাদের। যার বাড়িতে থেকে আরেফ শিক্ষকতা করে। এবার শুরু হয় আরেফের আত্মজিজ্ঞাসা। 'কোন দিকে যাবে সে? চারটি পথের কোনটি ধরবে? 'শেষে অনির্দিষ্টভাবে একটি পথ ধরেই সে হাঁটতে শুরু করে। ' ঘটনাটি আত্মবিশ্লেষণে আগ্রহী করে তাকে। তার মনে হয় 'যুবতী নারীর হত্যাকারী কে? সে নিজেই নয়তো? সে যদি অকারণে বাঁশঝাড়ে উপস্থিত না হোত তবে বোধহয় দুর্ঘটনাটি ঘটতো না। '...এ হলো অস্তিবাদীর সংশয়। বিশ শতকের পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক জঁপল সার্ত, আলবের কামু র সৃষ্টির মধ্যে আমরা নায়কের এই গভীর আত্মসংশ্লেষণ দেখেছি যখন সে একজন হত্যাকারীকে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার করে দেখছে।

আসল নেপথ্যঘটনা হলো এই যে বড়বাড়ির ভন্ড দরবেশ কাদের মাঝির বৌএর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত ছিল। আরেফের পায়ের শব্দ শুনে সে সতর্ক হয়ে যায় শুধু নয় বৌটির স্বামী ওই মাঝি এসে গেছে মনে করে ভয়ে ক্রোধে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুবতীর গলা টিপে তাকে খুন করে বসে। এই ঘটনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় আরেফ ঘটনাটি পুলিশকে জানায় ও সত্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব নিতেই তার মনে হয় সেই যেন যুবতীর আততায়ী। কারণ সে যদি তখন বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে উঁকি না মারতো তাহলে হয়তো এরকম নৃশংস ভাবে যুবতীটিকে খুন হতে হোত না। এখান থেকেই আরেফের অন্তর্দন্দ্বের সূত্রপাত।

কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপাড়া গ্রামের 'টেনেটুনে আইএ পাস' ইশকুল মাস্টার আরেফ আলী ভীষণ ভাবেই একজন সমাজনির্ভর মানুষ। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। বড়ো চাকরি থেকে অবসরপাওয়া কর্তা দাদাসাহেব ও তার দুশ্চরিত্র ভাই কাদেরকে নিয়ে আঁকা হয়েছে বাঙালি মুসলমান সমাজের বাস্তব ছবি। লেখক দার্শনিক অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় তাঁর 'বিবেকী ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'চাঁদের অমাবস্যা'য় তিনি যে মানবীয় সংকটকে উপন্যাসের কেন্দ্রিয় বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন এবং এই জটিল গভীর ব্যক্তিক ও সার্বিক বিষয়টিকে যে তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টি ও সুবেদী কল্পনা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নিতান্তই দুর্লভ। ওয়ালীউল্লার চেতনায় ডস্টয়েভস্কি কাফকা ফকনার কামু প্রমুখের প্রভাব পড়ে থাকা সম্ভব। কিন্তু তিনি তাকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মস্থ করেছিলেন। ফলে যে দর্পণটিতে আমরা আমাদের বিপন্ন বিমূঢ় সংকটাক্রান্ত দ্বিধাদীর্ণ মুখ দেখে চমকে উঠি সে দর্পণ নৈর্ব্যক্তিক থাকে না। সেটি হয়ে ওঠে একজন বিশেষ ব্যক্তি, বাইশ-তেইশ যার বয়স,যে ভিতরে অশান্তির জ্বালা নিয়ে 'ভক্তিমান শান্তচিত্ত ব্যক্তির মতো নামাজ পড়ে', যে দরিদ্র সন্ত্রস্ত কিন্তু জ্যোৎস্নারাতে ব্যাঞ্জিত বিশ্বের নিভৃত আলাপ যার অশ্রুত নয়,যে নিঃসঙ্গ কিন্তু হৃদয়বান, নিজেকে নানাভাবে প্রতারণা করার মতো কল্পনাশক্তির অধিকারী যে, যার দায়িত্ববোধ প্রবল ও অনতিক্রম্য,ভয় ও নৈরাশ্য নিয়েই যে শেষ পর্যন্ত সত্যের মুখোমুখি হতে সক্ষম।'

একটি সেমিনারে জনৈক সমালোচক 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটিকে 'রহস্যোপন্যাসের স্বাদে ঋদ্ধ' (থ্রিলার)এমন মন্তব্য করায় লেখক ওয়ালীউল্লা কিছুটা বিব্রত ও নিরাশ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার ইচ্ছে সাংবাদিক রিপোর্টারের ঊর্ধে ওঠা। কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক। তা হলে কষ্ট

করে লেখার প্রয়োজন কি?মনের কোণে লুকানো আশা বা স্বপ্নের (সেসবের দাম যা-ই হোক) কথা কিছু প্রকাশ না করলে কি চলে?'

মূলত এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের বিষয় একটি হত্যাকাণ্ড কে কেন্দ্র করে একজন বিবেকী ইশকুলমাস্টারের জটিল মনোজাগতিক বিশ্লেষণ। অনুষঙ্গে এসেছে মুসলমান সমাজ। ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তিনি আঘাত করেছেন। অজ্ঞমূর্খ একই সঙ্গে লম্পট লোভী ও নির্যাতক মোল্লা মৌলবীদের কড়া ভঙ্গিতে ও ভাষায় ভর্ৎসনাও করেছেন যার মধ্যে দিয়ে ওয়ালীউল্লার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে।

ওয়ালীউল্লার সর্বশেষ এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সৃষ্টি 'কাঁদো নদী কাঁদো'। এর ক্যানভাস আগের দুটির তুলনায় বেশ খানিক বড়ো। এর প্রকরণও যথেষ্ট জটিলতর। বিশেষ জনগোষ্ঠীর চৈতন্যধারাকে আবিষ্কার করার অভিযাত্রা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একইসঙ্গে এক মূক ও মুখর জনযাত্রার বাঙ্ময় বর্ণময় ছন্দময় অভিজ্ঞান।

বাঙালি মুসলমানের একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক সত্তার একটি অতুলনীয় অনন্য বিবৃতি এই 'কাঁদো নদী কাঁদো'। কুমুরডাঙা শহরের বিচিত্র কাহিনি যা পাঠককে শুনিয়েছেন ঔপন্যাসিক তা যেন বাংলাদেশের প্রতীক। বাকাল নদীতে চরা যেন বাঙালি মুসলমানের জীবনের ওপর চড়া পড়ারই প্রতীক। সকিনা যে বাকাল নদীর নিঃশব্দ ক্রন্দন শোনে তা যেন আমাদের জীবনের প্রতিনিধি। তারই নিঃশব্দ কান্না। পাকিস্তানোত্তর উঠতি বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি মহম্মদ মুস্তাফা। এই উপন্যাসের প্রধান গুণ এর সময়হীনতা। স্থান -কালের গন্ডি অতিক্রম করে গেছেন ঔপন্যাসিক। প্রধানত এটি চেতনপ্রবাহ জাতীয় উপন্যাস। কোথাও জীবনের জটিলতা কোথাও এর প্রবাহ স্বতশ্চল। তবে সব মিলিয়ে যেন এক নিরবচ্ছিন্ন জার্নি। অস্তিত্ব ও চেতনপ্রবাহের মহাযাত্রা।

'বহুদিন ধরে সে কেবল দর্শক ছিল যে দর্শক দেখে কিন্তু কিছু অনুভব করে না। অর্থ বুঝলেও তা হৃদয় স্পর্শ করে না। অশ্রু চোখ থেকে নাবে অন্তর থেকে উঠে আসে না।'

অথবা

'সে অশ্রু চোখেরই অশ্রু....হৃদয়ের অশ্রু নয়। হৃদয়ের অশ্রু দেখা দিতে সময় লাগে....'

অথবা

'তখন সূর্যাস্ত শুরু হয়েছে। যারা স্টীমারযোগে নিয়মিত ভ্রমণ করে তারা জানে এ সময়ে যাত্রীদের মধ্যে অজান্তেই নীরবতা নেমে আসে.....উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিনরাতের সন্ধিক্ষণে যে বিচিত্র অসীমতা প্রকাশ পায় তারই স্পর্শে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। নীরবতা আরও ঘনীভূত হয়। এবার শুধু পানির গর্জন নয় দূরে যে ঢেউ অস্ফুট শব্দের মতো ছড়িয়ে পড়ে তার ক্ষীণ শব্দও শুনতে পায়.....সে ঢেউ সহসা দৃষ্টিগোচর হয় তো বা ছায়াচ্ছন্ন আকাশে দৃষ্টিহীন ভাবে উড়তে থাকা পথহারা কোনো পাখি নজরে পড়ে। '.....

যেন মনে হচ্ছে অবান্তর সংলাপ। অলস চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে চলেছে লস্কর সর্দার, কালুমিঞা, করিমবক্স, বাদশা মিঞা, জমিদারবাবু, আমেনা, খাদেজা, সখিনা দের নিত্যদিনের পতনঅভ্যুদয় পন্থা। নানা প্রক্রিয়ায় তাদের বেঁচে থাকার ও অস্তিত্ব রক্ষার অর্থ বা অর্থহীনতা। ভালো-মন্দের নিশ্চয়তা -অনিশ্চয়তার মিশ্রণে যে জীবন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহে যে উপলমসৃণ যাত্রাপথ সেই চৈতন্যস্রোতকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন দক্ষ শিল্পীর তুলিতে।

‘ছোটবেলাতেই লোকটির মধ্যে কৌতূহল টা দেখা গিয়েছিল.....সবকিছু ভুলে ঘন্টার পর ঘন্টা সে মানুষের জীবনযাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো.....’

অথবা

‘সে বাড়িতে সাংসারিক কাজকর্মে আত্মমগ্ন মেয়েপুরুষেরা তার চোখের সামনে যে চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতো সে চলচ্চিত্রে না ছিল কোনো নায়কনায়িকা,না কোনো কাহিনী। এসব গতানুগতিক দৃশ্যই তার কচিমনে মায়াজাল বিস্তার করতো। একই দৃশ্য দেখে তার সাধ মিটতো না,মোহ ভাঙতো না। আরো পরে যখন কিছু বুদ্ধি হয়েছে,বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে তখন পুনঃকৃত্য প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যেই সে বৃহত্তর কিছু আবিষ্কার করে। সেদিন থেকে সে বুঝতে পারে প্রতিদিন একই কাজ করে মানুষ সুখদুঃখ আশাআকাঙ্খা নিয়ে একটি সুদীর্ঘ জীবনকাহিনী রচনা করে পদে পদে তিলে তিলে।’

‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসের ভাষা গাঢ়বদ্ধ ক্লাসিকধর্মী। গতিময় ও সাংকেতিক। অস্তিত্বের সমস্যাকেই তিনি এই জটিল ও বহুস্তরিক বহুমাত্রিক গ্রন্থিবন্ধনে বেঁধেছেন। কোথাও তার ইচ্ছাকৃত শিথিলতা কোথাও অপরিকল্পিত চেতনার অন্তহীন উজানস্রোত। একটি সামাজিক ব্যবস্থায় জাতির ও ব্যক্তির বর্ণময় অফুরন্ত বর্ণমালা। বাংলা উপন্যাসের প্রাকরণিক প্রথাকে অগ্রাহ্য করে গভীর সামাজিক ও জাতিগত অস্তিত্বে গভীর ও জটিল বিশ্লেষণ এই উপন্যাস সৈয়দ ওয়ালীউল্লাকে অবিস্মরণীয় করেছে।

পঠিত গ্রন্থ ও তথ্যঋণ

ক) ‘লালসালু’ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লা

খ) ‘চাঁদের অমাবস্যা’ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লা

গ) ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লা

ঘ) ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লার জীবন ও সাহিত্য’ : সৈয়দ আবুল মকসুদ

ঙ) প্রবন্ধ : বিবেকী ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লা : শিবনারায়ণ রায়।